পূর্ব থেকে পশ্চিম

পর্বঃ ১

ধূলিবালিময় দূষিত শহর হলেও খুব ভোরবেলাতে ঢাকার বাতাস কিন্তু মোটামুটি সতেজ একটা অনুভূতিই এনে দেয়। তাই গাড়ির সাইডগ্লাসটাকে আরো একটু টেনে দিতে একটুও আপত্তি হয়নি আমার। এয়ারপোর্ট রোডের একপাশ ধরে একটানা গাড়ী চলছে। কিছুক্ষণ পরই আমার ফ্লাই করবার কথা। চুপচাপ নিজের মনে নিজেই ভাবলাম, এই ঢাকা শহরটাও দেখি কম ছলনা জানে না। রূপের তাহার কমতি থাকতে পারে, তাই বলে ছলনা করতে বাকী রাখেনি একটুও। তা না হলে, ধূলিবালিময় দূষিত এই শহরটা ছেড়ে যেতেইবা শুধু শুধু আমার কষ্ট হবে কেন?

মায়ের কথা বলি, বাংলার মায়েদের কাজই হচ্ছে ছেলে-মেয়ে দেশের বাইরে যাবার সময় কান্নাকাটি করে ভাসিয়ে ফেলা। আমার বিরক্ত হবার ভয়ে মা-আমার মনের মাধুরী মিশিয়ে কাঁদতে না পারলেও খুব একটা কমও যাননি। অন্যদিকে, অযথাই কিছু সাবধানতার বাণী আর তথাকথিত সুপরামর্শ দিয়ে বাবা যথারীতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্পন্ন করলেন। গতকিছুদিন ধরে আমার ছোটবোনেরা শহর ঘুরে ঘুরে আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনেছে আর ইচ্ছেমত চোখের পানি মুছেছে। হয়তো এ-সব কারণেই বাংলায় ‘পরিবার’ আর ‘বন্ধন’ শব্দদুটো একটি আরেকটির পরিপূরক হয়ে উঠেছে। মাঝখানে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে ‘মায়া’।

অথচ কি অদ্ভুত! সবকিছু ফেলে রেখে আমার কষ্ট হচ্ছে ঢাকা শহরের জন্য, আমার ফেলে আসা শৈশবের জন্য। এতদিন যেন আমার শৈশবের স্মৃতি বুকে আগলে আমি বেড়ে উঠছিলাম এই-শহরে। আমি নিয়তির কাছে ঋণী, এ-জন্য যে আমার শৈশবটা গ্রামে কেটেছে। কৃষকের সাথে কেটেছে; জেলেদের সাথে কেটেছে, কামারের-কুমোরের সাথে কেটেছে; ডানা-ভাঙ্গা শালিকের সাথে, কলমির কাঁকরোল, বাঁধ-ভাঙ্গা-বৃষ্টির, আচানক-বিজলীর আলোকের সাথে কেটেছে। আমার গ্রীষ্ম-বর্ষা, আমার শরৎ শৈশব, আমার হেমন্ত কৈশোর, আমার শীত-বসন্তের প্রাকৃতিক জীবন,

আমি যাপন করেছি সেখানে।আমার সেই জীবনের কথা মনে পড়ছে, আর মনে পড়ছে মহর্ষির মত হেঁটে যাওয়া আমার শৈশবের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কথা,দাদী-নানীদেরর মত বয়স্কদের কথা।মনে পড়ছে তাদের চাহনির কথা; তাদের চোখে মুখে যেন থাকতো গত জনমের জমে থাকা অভিজ্ঞতার ছায়া, যেন তারা জানে সব ইতিহাস, আমার ইতিহাস, আমাদের ইতিহাস, পূর্বপুরুষের ইতিহাস,উৎপত্তির ইতিহাস।

গাড়ী থেমে যাওয়ার ধাক্কায় হঠাৎ ঘোর ভাঙ্গে। সবকিছু আরো একবার চেক করে নিলাম। সবকিছু বুঝে নিয়ে এয়ারপোর্টের ভিতরে ঢোকাবার আগ মুহূর্তে মা শেষবারের মত আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি, পৃথিবীর সব ‘মা’ কি এই একই কাজ করে? হিটলারের মা’ও কি তার ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতো? কাল-কালচারের বিবর্তনে জাতিতে জাতিতে এসেছে পরিবর্তন, এসেছে বৈচিত্র্য; কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে আদিম স্নেহ, মাতৃস্নেহের পরিবর্তন ঘটেনি একটুও; এখানে বিবর্তন বলে কিছু নেই,নেই কোন রূপান্তর; যুগে-যুগে, কালে-কালে, দেশে-দেশে, কি জাতিতে, কি প্রজাতিতে, এর একই রূপ।

উপমহাদেশের বাইরে এটাই আমার প্রথম যাওয়া,প্রথম ফ্লাই করা।তাই একটু তাড়াতাড়ি সিকিউরিটি চেক-এর লাইনে চলে গেলাম।তারপর কাতার এয়ারওয়েজের লাইনে দাঁড়ালাম বোর্ডিং পাস নেবার জন্য।এই এয়ারয়েজ সিলেকশান আর এয়ার টিকিট কাটা দেখি রীতিমত নাটকীয় ব্যাপার।এ-ব্যাপারে অভিজ্ঞরা তাদের সব পরামর্শ কি আমাকেই দিয়ে দিল, না কি সবাইকে তারা এ-রকম বিনা পয়সার পরামর্শ দিয়ে যায়, সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।অবশ্য এ-দূর্দিনের বাজারে সস্তা পরামর্শ ছাড়া অন্য কিছু আশা করাটাও মুশকিল।কেউ বলে ‘গালফ এয়ার’ ত্রিশ বছর আগের বিমান দিয়ে চালায়; কেউ আবার সংশোধন করে দিয়ে আঙ্গুলে আঙ্গুল চেপে হিসেব করে বলে দিল, না ঠিক ত্রিশ বছর না, ওরা আসলে ঊনত্রিশ বছর আগের বিমান দিয়ে চালায়।কেউ বলল, ‘এমিরেটস; এর উপর কোন বিমান হয় না কি, এটা হল সুপার ক্লাস; কেউ বলে, কাতারের আমীর প্রতি মাসে একটা করে নতুন বিমান ক্রয় করে, কাতারের উপর সার্ভিস দেয়া অসম্ভব; কেউ আবার তামাশা করে বলে,‘জেট এয়ার’-এও যাওয়া যেতে পারে,ওটাতে বিমানে উঠেও টিকিট কাটা যায়, ওরা বিমানের দরজায় দাঁড়িয়ে ঢাকার রাস্তার ৭ নাম্বার গাড়ীর মত যাত্রী ডাকে।মজার ব্যাপার হচ্ছে এরা এমন

ভাবে নাম্বার সহ বিমানের চৌদ্দ জেনারেশানের খবর বলে, বোয়িং সেভেন জিরো ধ'রে যে বলতে শুরু করে, মনে হয় এরা গত তিনপুরুষ ধরে বিমান কেনা-বেচা ব্যাবসার সাথে জড়িত। যাই হোক, এয়ারওয়েজের লাইন ছেড়ে ধীরে ধীরে ইমিগ্রেশান কাউন্টারের দিকে যেতে থাকলাম।

যে 'ভদ্রলোক' ইমিগ্রেশানের কাগজপত্র দেখে একজন একজন করে ভিতরে প্রবেশ করাচ্ছেন তাকে আসলে শুধু 'লোক' বলতে পারলেই খুশি হতাম।একজনের জিনিসপত্র দেখতেই এত সময় নিচ্ছেন, তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে এয়ারপোর্টগুলোতে 'বাহাত্তর ঘন্টায় একদিন'।আরেকটু হলেই হয়ত বলে বসবেন, 'আপনারা একটু লাইনে দাঁড়ান, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।' আশার কথা হচ্ছে কারো সাথেই তিনি কোন ঝামেলা করছেন না, সব দেখে-শুনে, এটা-সেটা কি সব বলে ভিতরে যাবার অনুমতি দিয়ে দিচ্ছেন।জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট নিয়ে এমনিতেই নানা-রকম গল্প প্রচলিত আছে। এখানকার লোকজন তাজমহলেরও নাকি অসংখ্য খুঁত বের করে ফেলতে পারেন; তারা নাকি দশমিনিটেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারেন, সিলেটের শাহজালালের মাজারের কাছে তাজমহল আসলে কিছুই না, তাজমহলতো মুরগীর ডিম রংয়ের একটা দালান মাত্র। অতএব, কোনো ঝামেলা যেহেতু করছেন না, কিছুটা দেরী হলেও লোকটিকে আমার ফেরেশতা টাইপ বলেই মনে হচ্ছে, আমি দূর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে দেখছি।

কিছুক্ষণ পর আমার পালা এলো।স্বাভাবিকভাবে ভদ্রলোক আমার পাসপোর্ট ভিসা সব কাগজপত্র দেখে নিলেন, সব ঠিক আছে। হঠাৎ করে মনে হলো তিনি কিছু একটা পেয়ে গেলেন, তার অলস ভাব কেটে গেল। তৎপর ভঙ্গিমায় আমাকে বলেন, 'আপনার জিও কোথায়?'।আমি প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে তাঁর দিকে তাকাতেই বলে,'জিও,গভর্মেন্ট অর্ডার।' আমি বললাম,'জিও-তো নেই'।তিনি বলেন,'আপনি যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সেহেতু আপানার দেশের বাইরে যেতে হলে অবশ্যই 'জিও' লাগবে।অতএব, 'জিও' না হ'লে আপনাকে যেতে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।' এমন বিজয়ীর ভঙ্গিতে লোকটা কথাগুলো বলছিলো মনে হচ্ছে এইমাত্র সে তার সমস্ত চাকুরীজীবনের সবচেয়ে গৌরবজনক কাজটা করার সুযোগ পেয়ে গেলো।অথচ কিছুক্ষণ আগেও তাকে আমার ফেরেশতা ব'লে মনে হচ্ছিলো।লাইনে দাঁড়ানো অন্য লোকগুলো সবাই কৌতুহলী ভঙ্গিতে ধারণা করার চেষ্টা করল, ঠিক

কি ব্যাপারে আমার সাথে সমস্যাটা হচ্ছে। তারা তাদের সমস্ত চোখমুখ দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করল আমার জন্য প্রকৃত অর্থেই তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তারা কিছুই করতে পারছেন না। আর অন্যদিকে আমি চিন্তা করতে চেষ্টা করলাম কী হতে পারে এর সমাধান আর কীই বা হতে পারে পরিণতি।...(চলবে)

পরশপাথর

সেপ্টেম্বার ০৮,২০০৯

Poroshpathor81@yahoo.com